আদ দুহা

৯৩

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদ্‌দুহা (وَالضُّحٰى) –কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। হাদীস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তাঁর মনে এই আশংকার উদয় হচ্ছিল, হয়তো তাঁর এমন কোন ত্রুটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সক্রিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রখর কিরণ যদি একনাগাড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহী নাযিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে ওঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদ্‌দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমি একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আর অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নায়ুর ওপর এর কী গভীর প্রভাব পড়তো তা আমি সূরা মুয্‌যাম্মিলের ৫ টীকায় বলেছি। পরে তাঁর মধ্যে এই মহাভার বরদাশৃত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ ফাঁক দেবার প্রয়োজন থাকেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া। আর এই সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির কসম খেয়ে তাঁকে এই মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করা হয়েছে যে, তার রব তাঁকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে

সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ষণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এটি তার অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য–সম্বলহীন ব্যক্তি মক্কায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তারা যে কোনদিন এত বড় বিস্ময়কর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোন দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ–সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিত্তশালী করেছি। এসব কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূরা ত্বা–হা'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এই আয়াতগুলোতে হযরত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জন্মের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এই সংগে তাঁকে একথাও বলেন যে, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এই ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

وَالضُّحٰى ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥

উজ্জ্বল দিনের কসম[১] এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়।[২] (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।[৩] নিসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।[৪] আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।[৫]

১. এখানে 'দুহা' শব্দটি রাতের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছে তাই এর অর্থ উজ্জ্বল দিবা। সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এর নজীর হিসেবে পেশ করা যায় :

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ –

'জনপদবাসীরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে পড়েছে যে, তাদের ওপর রাতে আমার আযাব আসবে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে তাদের ওপর দিন–দুপুরে আমার আযাব আসবে যখন তারা খেলতে থাকবে?" (৯৭–৯৮ আয়াত) এই আয়াতগুলোতেও "দুহা" (ضُحًى) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাতের মোকাবেলায়। আর এর অর্থ চাশ্‌ত এর সময় নয়, বরং দিন।

২. মূলে রাতের সাথে سَجٰى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র অন্ধকার ছেয়ে যাবারই নয় বরং নিঝুম ও শান্ত হয়ে যাবার অর্থও পাওয়া যায়। সামনের দিকে যে বর্ণনা আসছে তার সাথে রাতের এই গুণাবলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

৩. হাদীস থেকে জানা যায়, কিছুদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ ছিল। এ সময়টা কতদিনের ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইবনে জুরাইজ ১২ দিন, কালবী ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস ২৫ দিন, সুদ্দী ও মুকাতিল এর মেয়াদ ৪৫ দিন বলে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজে এ জন্য ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীরাও তাঁকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। কারণ তাঁর ওপর নতুন নতুন সূরা নাযিল হলে তিনি তা

লোকদের শুনাতেন। তাই দীর্ঘদিন যখন তিনি লোকদেরকে কোন অহী শুনালেন না তখন বিরোধীরা মনে করলো এ কালাম যেখান থেকে আসতো সে উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। জন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন জিব্রীল আলাইহিস সালামের আসার সিলসিলা থেমে গেলো, মুশরিকরা বলতে শুরু করলো ঃ মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, সাঈদ ইবনে মনসূর ও ইবনে মারদুইয়া) অন্যান্য বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল (সা)–এর চাচী আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের ঘর ছিল তাঁর ঘরের সাথে লাগোয়া। সে তাঁকে ডেকে বললো ঃ "মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।" আউফী ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ কয়েকদিন পর্যন্ত জিব্রীলের আসা বন্ধ থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকরা বলতে শুরু করলো, তার রব তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। কাতাদাহ ও যাহ্‌হাক বর্ণিত মুরসাল* হাদীসেও প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) গভীর দুঃখ ও মর্মব্যথার কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কারণ প্রেমাস্পদের দিক থেকে বাহ্যত অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবার পর এই প্রাণান্তকর সংঘাত সংগ্রামের মাঝ দরিয়ায় যে শক্তিটি ছিল তাঁর একমাত্র সহায় তার সাহায্য থেকে বাহ্যত বঞ্চিত হওয়া এবং এর ওপর বাড়তি বিপদ হিসেবে শত্রুদের বিদ্রূপ–ভর্ৎসনা ইত্যাদি এসব কিছু মিলে অবশ্যি তাঁর জন্য মারাত্মক ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁর মনে বারবার এ সন্দেহ জেগে থাকবে যে, তিনি এমন কোন ভুল তো করেননি যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি হক ও বাতিলের এই লড়াইয়ে তাঁকে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন।

এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়। এতে দিনের আলোর ও রাতের নিরবতার কসম খেয়ে রসূলুল্লাহকে (সা) বলা হয়েছে ঃ তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। একথার জন্য যে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই দু'টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়া এবং রাতের নিঝুমতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়া যেমন আল্লাহর দিনে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রাতে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার জন্য নয় বরং একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনে এই দু'টি অবস্থার উদ্ভব হয় ঠিক তেমনি তোমার কাছে কখনো অহী পাঠানো এবং তা পাঠানো বন্ধ করাও একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনেই হয়ে থাকে। মহান

* মুরসাল এমন এক ধরনের হাদীসকে বলা হয় যেখানে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হিসেবে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি অর্থাৎ তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমামদের মধ্যে আবু হানিফা (র) ও মালিক (র)–ই একমাত্র এ ধরনের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) মুরসাল হাদীসের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন এবং এর বিপরীত রায়কে রদ করেছেন। (আ'লামুল মুকিইন, ইবনে কাইয়েম) –অনুবাদক

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে অহী পাঠান এবং যখন অহী পাঠান না তখন মনে করতে হবে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমাকে ত্যাগ করেছেন—এ ধরনের কোন কথা বা বক্তব্যের কোন সম্পর্ক এখানে নেই। এ ছাড়া এই বিষয়বস্তুর সাথে এই কসমের আরো সম্পর্ক রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, দিনে সূর্যের কিরণ যদি অনবরত মানুষের ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তাকে ক্লান্ত ও অবশ করে দেবে। তাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত দিনের আলো বিরাজ করে। এরপরে রাতের আসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে মানুষ ক্লান্তি দূর করতে ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে অহীর কিরণ যদি অনবরত তোমার ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তোমার স্নায়ুর সহ্যের অতীত হয়ে পড়বে। তাই মাঝে মধ্যে ফাতরাতুল অহীর (অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাওয়া) একটি সময়ও আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। এভাবে অহী নাযিল হওয়ার কারণে তোমার ওপর যে চাপ পড়ে তার প্রভাব খতম হয়ে যাবে এবং তুমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ অহী সূর্যের উদয় যেন ঠিক উজ্জ্বল দিনের সমতূল্য এবং ফাতরাতুল অহীর সময়টি রাতের প্রশান্তির পর্যায়ভূক্ত।

৪. মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুখবরটি এমন এক সময় দেন যখন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছিল তাঁর সহযোগী এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতি ছিল তাঁর বিরোধী। বাহ্যত সাফল্যের কোন দূরবর্তী চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের প্রদীপ মক্কাতে টিম টিম করে জ্বলছিল। চতুরদিকে ঝড় উঠেছিল তাকে নিভিয়ে দেবার জন্য। সে সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন ঃ প্রাথমিক যুগের সংকটে তুমি মোটেই পেরেশান হয়ো না। তোমার জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হবে। তোমার শক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে। তোমার প্রভাব ও অনুপ্রবেশের সীমানা বিস্তৃত হতেই থাকবে। আবার এই ওয়াদা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে এ ওয়াদাও আছে যে, আখেরাতে তুমি যে মর্যাদা লাভ করবে তা দুনিয়ায় তোমার অর্জিত মর্যাদা থেকে অনেক গুণ বেশী হবে। তাবারানী তাঁর আওসাত গন্থে এবং বাইহাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমার পরে আমার উম্মাত যেসব দেশ জয় করবে তা আমার সামনে পেশ করা হয়। তাতে আমি খুব খুশী হই। তখন মহান আল্লাহ একথা নাযিল করেন যে, আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়া থেকেও ভালো।"

৫. অর্থাৎ দিতে কিছুটা দেরী হলে সেসময় দূরে নয়, যখন তোমার ওপর তোমার রবের দান ও মেহেরবানী এমনভাবে বর্ষিত হবে যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। এই ওয়াদাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেই পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র আরব ভূখণ্ড, দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সিরীয় সীমান্ত ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। আরবের ইতিহাসে এই প্রথমবার এই সমগ্র ভূখণ্ডটি একটি আইন ও শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়। যে শক্তিই এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যায়। লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর কালেমায় সমগ্র দেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। যে দেশে মুশরিক ও আহ্‌লি কিতাবরা নিজেদের মিথ্যা মতবাদ ও

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পাননি? তারপর তোমাকে আশ্রয় দেননি?[৬] তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় পান, তারপর তিনিই পথ দেখান।[৭] তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন।[৮] কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।[৯] প্রার্থীকে তিরস্কার করো না।[১০] আর নিজের রবের নিয়ামত প্রকাশ করো।[১১]

আদর্শকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সেখানে মানুষ কেবল আনুগত্যের শিরই নত করেনি বরং তাদের মনও বিজিত হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। জাহেলিয়াতের গভীর পংকে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এমনভাবে বদলে যায় যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। এরপর নবী (সা) যে আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা বিপুল শক্তিমত্তা সহকারে জেগে ওঠে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশের বিরাট অংশে ছেয়ে যায় এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এসব মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন দুনিয়ায়। আর আখেরাতে তাঁকে যা কিছু দেবেন তার বিপুলতা ও মহত্বের কল্পনাই করা যাবে না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা ১১২ টীকা)

৬. অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করার ও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে তখন থেকেই তো আমি তোমার প্রতি মেহেরবানী করে আসছি। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ছয় মাসের সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই এতিম হিসেবেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিনও তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত মা তাঁকে লালন–পালন করতে থাকেন। তাঁর স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হবার পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদা কেবল তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেনই তাই না বরং তাঁর জন্য গর্বও করতেন। তিনি লোকদের বলতেন, আমার এই ছেলে একদিন দুনিয়ায় বিপুল খ্যাতির অধিকারী হবে। তার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন–পালনের দায়িত্ব নেন। চাচা তাঁর সাথে এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন যে, কোন পিতার পক্ষেও এর চেয়ে বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এমনকি নবুওয়াত লাভের পর সমগ্র জাতি যখন তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তার সাহায্যার্থে চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

৭. মূলে "দাল্লান" (ضَالًّا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এসেছে "দালালাত" (ضلالت) থেকে। এর কয়েকটি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ গোমরাহী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এক ব্যক্তি পথ জানে না, এক জায়গায় গিয়ে সে সামনে বিভিন্ন পথ দেখে কোন্ পথে যাবে তা ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিস। আরবী প্রবাদে বলা হয়, ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّبَنِ অর্থাৎ পানি দুধের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মরুভূমির মধ্যে যে গাছটি একাকি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার আশেপাশে কোন গাছ থাকে না তাকেও আরবীতে "দাল্লাহ" বলা হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থেও "দালাল" (ضلال) বলা হয়। যেমন, অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও "দালাল" শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার গাফলতির জন্যও "দালাল" ব্যবহার করা হয়। যেমন কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত" দেখা যায় ঃ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى অর্থাৎ "আমার রব না গাফেল হন আর না তিনি ভুলে যান।" (ত্বা-হা ৫২) এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে প্রথম অর্থটি এখানে খাপ খায় না। কারণ ইতিহাসে রসূলের শৈশব থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়-কালের যেসব অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে কোথাও তিনি কখনো মূর্তিপূজা, শিরক বা নাস্তিক্যবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন অথবা তাঁর জাতির মধ্যে যেসব জাহেলী কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রচলন ছিল তার সাথেও তিনি কোনক্রমে জড়িত হয়েছিলেন বলে সামান্যতম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই وَوَجَدَكَ ضَالًّا বাক্যে কোনক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে অন্যান্য অর্থগুলো কোন না কোনভাবে এখানে খাপ খেতে পারে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে হয়তো প্রত্যেকটি অর্থই এখানে কার্যকর হতে পারে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লম আল্লাহর অস্তিত্বে ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। সে সময় তাঁর জীবন গোনাহ মুক্ত এবং নৈতিক গুণাবলী সমন্বিত ছিল। কিন্তু সত্যদীন এবং তার মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَٰبُ وَلَا الْإِيمَانُ অর্থাৎ "তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।" (আশ্শূরা ৫২ আয়াত) এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, নবী (সা) একটি জাহেলী সমাজের বুকে হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং নবুওয়াত লাভের আগে একজন পথপ্রদর্শক ও পথের দিশা দানকারী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসেনি। এর এ অর্থও হতে পারে যে, জাহেলিয়াতের মরুভূমিতে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি নিসংগ বৃক্ষের মতো। এই বৃক্ষের ফল উৎপাদনের ও চারাগাছ বৃদ্ধি করে আর একটি বাগান তৈরি করার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের পূর্বে এ যোগ্যতা কোন কাজে লাগেনি। এ অর্থও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে তা নষ্ট হতে বসেছিল। "দালাল"কে গাফলতির অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পরে আল্লাহ তাঁকে যেসব জ্ঞান ও সত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন ইতিপূর্বে তিনি সেগুলো থেকে গাফেল ছিলেন। কুরআনেও এক জায়গায় বলা হয়েছে। وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَٰفِلِينَ "আর যদিও তুমি ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে গাফেল ছিলে।" (ইউসুফ ৩) এ ছাড়াও দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৮৩ আয়াত এবং আশ্ শু'আরা ২০ আয়াত)

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বাঁদী লাভ করেছিলেন। এভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন। তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। এই সুবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাঢ্যতা নিছক স্ত্রীর ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৯. অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিজে এতিম ছিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন এবং এতিম অবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য–সহায়তা দান করেছেন, তাই আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমি কখনো কোন এতিমের প্রতি জুলুম করবে না।

১০. এর দু'টি অর্থ হয়। যদি প্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী হিসেবে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করো আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দাও। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—"তুমি অভাবী ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর যদি প্রার্থীকে জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দাও এবং জ্ঞানের অহংকারে বদমেজাজ লোকদের মতো ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—"তুমি পথের খোঁজ জানতে না তারপর তিনিই তোমাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।" হযরত আবু দারদা (রা) হাসান বসরী (র), সুফিয়ান সওরী (র) এবং অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এই দ্বিতীয় অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তাদের মতে বক্তব্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এ বক্তব্যটি وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى এর জবাবেই দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১. নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এমনসব নিয়ামত হয়, যা এই সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূলকে দান করেছিলেন। আবার এমন সব নিয়ামতও হয়, যা এই সূরায় প্রদত্ত নিজের ওয়াদা এবং পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা দান প্রসংগে তিনি রসূলকে প্রদান করেছিলেন। এর ওপর আবার হুকুম দেয়া হয়েছে, হে নবী! আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার প্রত্যেকটির কথা স্মরণ কর। এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে এবং নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি নিয়ামত বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ মুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং

একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নয়তো এর মধ্যে কোন একটিও আমার নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের ফসল নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নবুওয়াতের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। লোকদের মধ্যে বেশী বেশী করে কুরআন প্রচার করে এবং তার শিক্ষাবলীর সাহায্যে মানুষের হৃদয়দেশ আলোকিত করে কুরআনের নিয়ামত প্রকাশ করা যেত পারে। পথহারা মানুষদের সরল সত্য পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং সবরের সাহায্যে এই কাজের যাবতীয় তিক্ততা ও কষ্টের মোকাবেলা করে হেদায়াত লাভের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। এতিম অবস্থায় সাহায্য–সহায়তা দান করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এতিমদের সাথে ঠিক তেমনি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করে এই নিয়ামতটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য ও অভাব থেকে সচ্ছলতা ও ধনাঢ্যতা দান করার জন্য যে অনুগ্রহ আল্লাহ করেছেন অভাবী মানুষদের সাহায্য করেই সেই নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। মোটকথা, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করার পর একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে তাঁর রসূলকে এই গভীর ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ হেদায়াত দান করেন।